

নাম: মো: সাজু ইসলাম

জন্ম তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: রিকশা চালক ,

শাহাদাতের স্থান : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদের জীবনী

"সন্তানের চাঁদমুখটাও দেখার

সুযোগ হলোনা সাজুর"

স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের বীরদের মধ্যে অন্যতম সাজু ইসলাম। তিনি ১৯৯৮ সালে ১৩ ডিসেম্বর পঞ্চগড় জেলার সদর থানার চিলাহাটি ইউনিয়নের টোকা পড়া সরদার পাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আজাহার আলী (৫৫) একজন রিকশা চালক এবং মা মোসা: ছামিনা আক্তার (৪২) একজন গৃহিণী। আজাহার ও সামিনার ঘরের প্রদীপ ছিলেন সাজু। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাজুই ছিল বড়। দরিদ্র হলেও আজাহার তার আদরের সন্তানকে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করেছেন। সারাদিন রিকশা চালিয়ে সন্তানের আবদার মেটানো এবং সাংসারিক খরচ বহন করতেন তিনি। সাজু স্কুলের পড়া চুকিয়ে দেবীগঞ্জের ডাউলগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তার বাবার কষ্ট দেখে সে পড়ালেখা না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টার পরে গাজীপুরে এশিয়া কম্পজিট লিমিটেডে একটা সাধারণ কর্মচারী পদে চাকরি পান।

চাকরির টাকা জমিয়ে সাজু প্রথমেই তাদের পূর্বের টিনের বাড়ি ভেঙে আধা পাকা বাড়ি করেন। কেননা অল্পতেই বৃষ্টির পানি টিনের ফুটা দিয়ে ঘরে পড়ত। এতে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ত ঘর। পাশাপাশি তার বাবা মায়ের দেখাশোনা এবং ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ চালাতেন তিনি। ২০২৩ সালে পারিবারিক ভাবেই বিয়ে হয় তার। চাকরির সুবাধে গাজীপুরের মাওনায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হলে সে বিভিন্ন সময় ছাত্র আন্দোলন অংশগ্রহণ করেন। ৩ দিনের কারফিউ শেষ হলে সে আবার গাজীপুরে কর্মস্থলে চলে আসেন। ঢাকায় আসার ৪ দিন পরে তাঁদের কোলজুড়ে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর মাত্র ২৬ দিন আগেই ছেলে সন্তানের বাবা হন তিনি। ছেলের নামও রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ বীর আবু সাঈদের নামের সাথে মিলিয়ে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০০৮ সালে আওয়ামী সরকার আসার পর থেকে তাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার কোটা পদ্ধতি চালু করে। তখন দেখা যেত যেকোনো চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা, নারী কোটা, পোষ্য কোটা, উপজাতি কোটা ইত্যাদি কোটায় চাকরি হত বেশি। এই কোটার সংখ্যাই ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। সরকারি চাকরিতে মেধাবীদের কোনো মূল্যায়ন করা হতনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের চাপে পড়ে নির্বোধের মত সকল প্রকার কোটা পদ্ধতি বাতিল করে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার। কিন্তু ২০২২ এ আবার সাজানো ভোটে জয়লাভ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আবারও আগের সেই কোটা পদ্ধতি চালু করে। এতে নিষ্পেষিত হতে থাকে মেধাবীরা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ জুলাই ২০২৪ এ আবাবো শান্তিপূর্ণ ভাবে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের লক্ষে সভা সমাবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকার এদিকে কর্তৃপাত করেনি। এতে দিনে দিনে আন্দোলন আরও বাড়তে থাকে। ১৫ আগস্ট এক সাংবাদিকের প্রশ্নে স্বৈরাচারী হাসিনা বলে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুত্রদের চাকরি দিবনা তো কি রাজাকারদের নাতিপুত্রদের চাকরি দিব?

এমন মন্তব্যে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থী ক্ষুব্ধ হয়ে সেদিন রাত ১১ টায় মিছিল বের করে। সেদিন শিক্ষার্থীরা একযোগে স্লোগান দেয় 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' 'কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার'।

এতে হাসিনা পাগল হয়ে পরের দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করতে থাকে। রক্তে লাল করতে থাকে রাজপথ। সেদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের আহত করে তাদের ছাত্র নামক সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দমে যাওয়ার বদলে মারমুখী হয়ে ওঠে। এতে ভয়ে ঘরে ঢুকতে থাকে ছাত্রলীগ। এরপরে তারা রাস্তায় পুলিশলীগ ও বিজিবি নামিয়ে গণহত্যা শুরু করে। তাও দমে যায়নি শিক্ষার্থীরা। এবার শিক্ষার্থীদের কষ্ট দেখে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। এর মধ্যেই স্বৈরাচারী সরকার কারফিউ জারি করে।

এর আগে সাজু তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে আসেন এবং সিজারের জন্য সকল বন্দোবস্ত করে ৩ দিনের কারফিউ শেষ হলে সে আবার গাজীপুরে কর্মস্থলে চলে আসেন। ঢাকায় আসার ৪ দিন পরে তাঁর স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সেদিন আনন্দে অস্থির হয়ে যায় সাজু। দেশের পরিস্থিতি খারাপ থাকার কারনে তিনি আর বাড়িতে সন্তানের চাঁদ মুখটাও দেখতে আসার সুযোগ পাননি। শিক্ষার্থীদের উপর জুলুম দেখে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে সকল মায়ী পিছুটানকে উপেক্ষা করে ৫ আগস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন।

আন্দোলনে যাওয়ার আগে তিনি তার স্কুলের বন্ধু স্বপনের সাথে মোবাইলে কথা বলেন। তখন তার বন্ধু তাকে বারবার আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে। তিনি বলেন, 'আমরা গরীব মানুষ আমরা আন্দোলনে গেলে পরিবার কে দেখবে?' কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, 'আমিও ত একসময় ছাত্র ছিলাম। তাদের এই দুর্দিনে আমাকে পাশে দাড়াতেই হবে। এই বলে সাজু আর দেরি না মরে গাজীপুরে মাওনাতেই আন্দোলনে যোগদান করেন।

এদিকে পেটোয়া পুলিশবাহিনী গুলি করে অকাতরে মানুষ মারতে থাকে। তারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের ভয় না করে চিৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায়।

এসময় পেটোয়া পুলিশবাহিনী ও বিজিবি বাহিনীর ছোড়া গুলির মধ্যে একটি গুলি এসে সাজু ইসলামের বুকে এসে লাগে। সেখানেই বুক ধরে পড়ে যায় সাজু।

পুলিশ, বিজিবি এমন বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়ছিল যে কেউ তার নিখর শরীরটাকে সরানোর সুযোগ পায়নি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রায় এক ঘন্টা রাস্তায় পরে ছিলেন সাজু। একঘন্টা পরে একটু সুযোগ পেয়েই কিছু স্থানীয় জনতা ও কারখানার কর্মচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে ভর্তি করান। হাসপাতালে ভর্তি করানোর সময় তিনি বেঁচে ছিলেন এবং বন্ধুর মোবাইল দিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাজুর গুরুতর অবস্থা দেখে রাত ১২ টায় অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপারেশনে তাঁর জন্য ৮ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন হয়েছিল। ডাক্তাররা খুব আন্তরিকতার সাথে তাঁর অপারেশন করে পেট থেকে বুলেটটি বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপারেশন শেষে তাঁকে আবার বেড রেফারেন্স করা হয়। পরের দিন ৬ আগস্ট খবর পেয়ে সকাল বেলা বাবা-মা ময়মনসিংহ মেডিকেল আসেন এবং সাজুর সাথে কথা বলেন। সেদিন দুপুরে সাজু হোসেনের মা মাল্টার রস খাওয়ানোর পরে সাজুর পেট ফুলতে থাকে। পেট ফুলে সাজুর অবস্থা খারাপ হওয়ায় ডাক্তার ডেকে এনে পেট ওয়াশ করানো হয়। এর পরে রাতে ডাবের পানি খাওয়ানো হয় সাজুকে। খাওয়ানোর এক পর্যায়ে কিছুক্ষণ পরে আবার পেট ফুলতে থাকে। এমতাবস্থায় ডাক্তার তাঁর অবস্থা খারাপ দেখে আইসিইউতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাত ১২ টার দিকে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয় সাজু ইসলামকে। আইসিইউতে সে ৫ দিন থাকার পরে তাঁর পেট আরও ফুলতে থাকে। পেট ফুলা অবস্থায় ১২ আগস্ট রাত ১২ টায় তিনি না ফেরার দেশে চলে যান। শেষবারের মতো তার ২৬ দিন বয়সী সন্তানের মুখটিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ছেলের মুখে মধুর একটি ডাক বাবা, সেই বাবা ডাকটিও কখনো শুনতে পাবেনা সাজু।

পারিবারিক অবস্থা

সাজুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তার স্ত্রী চিতকার করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অসহায় বাবা-মা শুধু মাথা চাপরাতে থাকে। ছোট ভাইও অসহায় হয়ে কাঁদতে থাকে।

তার মৃত্যুর খবর যখন মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় তখন ছুটে আসে তার ছোট বেলার বন্ধু স্বপন। ছুটে আসে এলাকাবাসী, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজন। বাড়িতে এক হৃদয় বিদারক কান্নার রোল পড়ে যায়। তাদের কান্নায়, তাদের দুঃখে যেন চারিপাশের বাতাসও কাঁদতে থাকে, এমনকি বাড়ির গবাদি পশু থেকে শুরু করে আশে পাশে যত পাখি এবং প্রাণী আছে তারাও সাজুর সন্তানের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে। কি হবে এখন আবু সাঈদের। পরে তাকে গোসল করিয়ে, স্থানীয় পারিবারিক কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

প্রস্তাবনা

সাজুর মৃত্যুর পরে তার পরিবার এখন অসহায়। উপার্জন করার মত এখন একমাত্র ব্যক্তি সাজুর বৃদ্ধ বাবা। তার এতিম সন্তানকে এবং বিধবা স্ত্রীকে দেখাশোনা করার মত আর কেউ নেই। তাদেরকে বড় অংকের আর্থিক সাহায্য করা দরকার এবং সাজুর বাবাকে একটি অটো রিকশা কিনে দেয়া যায়। এতিম সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া জরুরি এবং বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া জরুরি।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম : মো: সাজু ইসলাম

জন্ম তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮

বাবার নাম : আজাহার আলী

মায়ের নাম : মোসা: সামিনা আক্তার

পরিবারের সদস্য : ছোট ভাই: মো: সামিউল ইসলাম, ৭ম শ্রেণির ছাত্র, ছোট ভাই

: বিধবা স্ত্রী

: এতিম ছেলে আবু সাঈদ (২৬ দিন)

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: টোকরা পাড়া সরদার পাড়া, ইউনিয়ন: চিলাহাটি, থানা: সদর, জেলা: পঞ্চগড়

ঘাতক : পেটুয়া পুলিশ লীগ ও বিজিবি

ঘটনার স্থান : ৫ আগস্ট, গাজীপুর মাওনা পাড়া কারখানার সামনে দুপুর প্রায় ১২ টায়

মৃত্যুর স্থান ও সময় : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (আইসিইউ) ১২ আগস্ট রাত ১২ টায়